প্র. পারিস্থিতিক অনুক্রমণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর. 4.

Ans:- পারিস্থিতিক অনুক্রমণ বলিলে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো একটি স্থানে জীব-সম্প্রদায়ের পরিবর্তন হয় এবং নতুন নতুন জীব-সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করে. এই প্রক্রিয়াতে একটি জীব-সম্প্রদায় অন্য এক জীব-সম্প্রদায়কে বসতি স্থাপনের স্থান ছেড়ে দেয়. যখন কোনো পরিবেশতন্ত্রে এক জীব-সম্প্রদায় অনেকদিন ধরে বাস করে, পারিস্থিতিক জীবগুলি মাটির পরিবর্তন ঘটায়. সুতরাং জীব-সম্প্রদায় অনুকূল হয় সেই পরিবর্তিত পারিস্থিতিতে আর নতুন জীব-সম্প্রদায় সেই স্থান পূরণ করে. ইহাকে অনুক্রমণ বলা হয়. পারিস্থিতিক অনুক্রমণের ফলে জলাভূমি একসময় স্থল ভূমিতে পরিণত হইতে পারে এবং তার ফলে জলজ উদ্ভিদের স্থানে স্থলজ উদ্ভিদ বসতি স্থাপন করে, একদিকে অনুকূল পরিবেশের ফলে ধাপে ধাপে একটির পর একটি জীব-সম্প্রদায়ে বসতি স্থাপন করে শেষে এক স্থায়ী স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে, এবং অনুক্রমণ শেষ হলে যাকে স্থিতিশীলতা চরম সম্প্রদায় গড়ে উঠে.

পারিস্থিতিক অনুক্রমণ কোনটির উদাহরণ —

১। জলাজ ভূমি ক্রমে স্থল হয় যে অনুক্রমণ প্রক্রিয়াতে চরম সম্প্রদায় গঠিত হয়.

২। নতুন করে আবাদ করা ভূমি পোড়ো জমি থেকে যে অনুক্রমণ প্রক্রিয়াতে চরম সম্প্রদায় গঠিত হয়.

৩। পাথর, বালি, পাললিক মাটিতে হওয়া অনুক্রমণ.

প্র. বায়োম কি? বায়োমাস কি? -

Ans:- জলবায়ু সম্পর্কিত বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বাসভূমিকে বায়োম বলে. যেমন- তৃণভূমি, জলাশয়, অরণ্য এরকম একাধিক বায়োম.

কোনো পরিবেশতন্ত্রের জৈবিক উপাদান সমূহের মোট ওজন বা পরিমাণকে বায়োমাস বলে.

R

৩. প্রাকৃতিক পরিবেশতন্ত্র সমূহ:-

প্রাণী বা উদ্ভিদের বাসস্থানের প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে পরিবেশতন্ত্রকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। স্থলজ পরিবেশতন্ত্র।
২। জলজ " ।

স্থলজ এবং জলজ পরিবেশতন্ত্রকে প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

1. স্থলজ পরিবেশতন্ত্রের মধ্যে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর গোষ্ঠী বা বায়োম:-
   - (i) তৃণভূমি বায়োম, বা সাভানা বায়োম;
   - (ii) অরণ্য " ,
   - (iii) মরুভূমি " ,
   - (iv) পার্বত্য " ,
   - (v) তুন্দ্রা অঞ্চল " ,
2. জলজ পরিবেশতন্ত্রের মধ্যে প্রাণী এবং উদ্ভিদের গোষ্ঠী বা বায়োম:-
   - (i) মিঠাজলীয় বা স্বাদু জলের উদ্ভিদ বা প্রাণীর বায়োম,
   - (ii) সামুদ্রিক " " " " ",

R

অরণ্য বায়োম:- গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ এবং বিশাল অঞ্চল-যেখানে বড় বড় গাছ রয়েছে যার ঘন-ঝোপঝাড়, লতা-পাতায় সূর্যালোকের নিম্নভাগে এবং আলোক খুবই কম পায় তাকে অরণ্য বলা হয়। অরণ্যই উদ্ভিদের পরিবেশ সংরক্ষণ করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং বায়ুমণ্ডলীয় জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জলবায়ুর প্রকৃতিতে জীবসম্প্রদায়ের বিস্তৃতি এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করে। ভৌগোলিক অবস্থিতি, মাটির এবং প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে অক্ষাংশভেদে বিভিন্ন প্রকারের পৃথিবীতে অনেক প্রকারের অরণ্য বায়োম দেখা পাওয়া যায়। যেমন —

1. উত্তরের পাইন জাতীয় অরণ্য বা সরলবর্গীয় অরণ্য:- উত্তর আমেরিকা, উত্তর ইউরোপ, উত্তর রাশিয়া এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া প্রভৃতি অঞ্চল এই অরণ্যের অন্তর্ভুক্ত, অভিধানে এই অরণ্যকে টাইগা বলা হয়।
2. প্রধান উদ্ভিদসমূহ হল - স্প্রুস, ফার (Fir), পাইন, হেমলক, বার্চ আদি
   এবং " প্রাণী " " - মেরু অঞ্চলের প্রাণী (Wolf, lynx, hare Snowshoe etc.).

2. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল :- উত্তৰ-মধ্য ইউৰোপ, পূব এছিয়া আৰু পূব আমেৰিকাত এই অঞ্চল অৱস্থিত।

প্ৰধান উদ্ভিদসমূহ হ'ল — বহল পাতযুক্ত উদ্ভিদ আৰু দীঘল কাঠ উৎপাদনকাৰী গছ, যেনে — Oak, Elm, Birch, Maple, chesunt etc.

প্ৰধান জন্তুবোৰ হ'ল — ভেকুলী, নেকেৰা বাঘ, কাছ, কেৰ্কেটুৱা, সাপ, এন্দুৰ, শিয়াল, ভালুক, হৰিণ আদি,

3. ক্ৰান্তীয় অঞ্চল :- এই অঞ্চল আমাজন উপত্যকা, আফ্ৰিকা, মধ্য আমেৰিকাৰ কেন্দ্ৰীয় অংশ, দক্ষিণ ভাৰত, উত্তৰ পূব ভাৰতত অৱস্থিত।

এই অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ, ফুল, বীজ, ফল, মাংসভোজী আৰু তৃণভোজী জন্তু দেখা পোৱা যায়,

4. ভূমধ্যসাগৰীয় বনাঞ্চল অঞ্চল :- এইবিধ অঞ্চল ভূমধ্যসাগৰীয় অঞ্চল, কেলিফৰ্ণিয়া, মেক্সিকো, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দক্ষিণ উপকূলত অৱস্থিত।

গছ-গছনিৰ চুটি ডাল আৰু সৰু পাতযুক্ত চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদৰ দ্বাৰা ইয়াৰ আকৃতি নিৰ্ধাৰিত কৰা হয়,

খাদ্য শৃংখল অনুযায়ী অঞ্চলটো বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ বাস কৰে আৰু অঞ্চলটোৰ মূল উৎপাদক (গোট) হ'ল গছ-গছনি, ঘাঁহ বন আদি তৃণভোজী প্ৰাণীবিলাকে, কেৰ্কেটুৱা, মেকুৰী, বান্দৰী, নানাবিধ কীট-পতঙ্গ আদিয়ে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। তৃণভোজীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকে নানাবিধ মাংসভোজী জন্তু, শিয়াল, সাপ, ভেকুলী, সিংহ, বাঘ আদি,

বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অণুজীৱ, যেনে — ভেঁকুৰ, বেক্টেৰিয়া আদি অঞ্চল পৰিৱেশতন্ত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। গছ-গছনিৰ মৃত অংশ মাটিত পৰাৰ পিছত এই অণুজীৱবিলাকে ও বেক্টেৰিয়াবিলাকৰ দ্বাৰা পচন ক্ৰিয়া হয় আৰু গছ-গছনিক আকৌ খোৱাক হিচাপে উৎপাদন অৱস্থাটো পৰিপূৰ্ণ কৰি ৰাখে,

২

টেলিফোনে কথা বলার নিয়ম :- আমাদের দৈনন্দিন জীবনে টেলিফোনের গুরুত্ব অপরিসীম। টেলিফোনের মাধ্যমে আমরা দূরের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি। টেলিফোনে কথা বলার কিছু নিয়ম আছে। সেগুলি মেনে চললে আমরা সহজে কথা বলতে পারি। যেমন— কারোর সঙ্গে আলোচনার শুরুতেই আমরা 'হ্যালো', অথবা আমেরিকায় 'হেলো', ইংল্যান্ডে 'হাউডু', এইসব বলে আলোচনা শুরু করি, তারপর নিজের পরিচয় দিই। তারপর — এই সময়ে আমরা কাকে কী বলতে চাই, তা স্পষ্ট করে বলা উচিত। তারপর — ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছাড়ার আগে 'গুডবাই' বলা উচিত। এছাড়া টেলিফোনে কথা বলার সময় কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে অযথা কথা বলা উচিত নয়। টেলিফোনে কথা বলার সময় মুখের খুব কাছে রিসিভার রাখা উচিত নয়। টেলিফোনে কথা বলার সময় চিবানো, খাওয়া, ধূমপান করা উচিত নয়। টেলিফোনে কথা বলার সময় ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে কথা বলা উচিত। টেলিফোনে কথা বলার সময় কোনো অসভ্য ব্যবহার করা উচিত নয়। টেলিফোনে কথা বলার সময় কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে অযথা কথা বলা উচিত নয়। টেলিফোনে কথা বলার সময় মুখের খুব কাছে রিসিভার রাখা উচিত নয়। টেলিফোনে কথা বলার সময় চিবানো, খাওয়া, ধূমপান করা উচিত নয়। টেলিফোনে কথা বলার সময় ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে কথা বলা উচিত। টেলিফোনে কথা বলার সময় কোনো অসভ্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

দূরদর্শনের ভাষণ :-